icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

# স্বাস্থ্য সংলাপ

ISSN 1021-2078

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ১৭ ■ সংখ্যা ১ ■ শ্রাবণ ১৪১৫

## স্বাস্থ্যসেবা-বিষয়ক কিছু জরুরি তথ্য

**মুসাফির মুঃ তাজুল ইসলাম**
আইসিডিডিআর,বি

**দৃশ্যপট ১**

গভীর রাতে বাড়িওয়ালী খালাম্মার তীব্র আর্তনাদে ঘুম ভেঙে গেলো। বাসার সবার চিৎকার ও কান্নাকাটিতে যে কঠিন সত্যটি আবিষ্কার করলাম তা হলো: খালাম্মার মেজোমেয়ে মনিকা বিষ খেয়েছে। প্রেমঘটিত ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে সন্ধ্যায় খালাম্মা নাকি তাকে বকাঝকা করেছিলেন। তারই জের ধরে মনিকা বিষ খেয়েছে। তাকে দ্রুত একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে নিলাম। ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ ভর্তি না-করে তাকে সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে রেফার করলো। সোহ্‌রাওয়ার্দি হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে জানা গেলো সেখানে বিষ-খাওয়া রোগী ভর্তি করা হয় না, কারণ পুলিশ কেইস হতে পারে। বিষ-খাওয়া, গুলি-খাওয়া, কিংবা মারামারিতে গুরুতর আহত রোগীদের ঠিকানা একমাত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

ততক্ষণে মনিকাকে নিয়ে আমাদের ৪০ মিনিট বয়ে গেছে। দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নেওয়ার পথে মনিকার জীবনের প্রদীপ নিভে গেছে। আলোচ্য মনিকা একটি কাল্পনিক চরিত্র হলেও এমন দুর্ঘটনায় যেকোনো সময় পতিত হতে পারে আপনার আপনজন, বন্ধু-বান্ধব ও নিকট-প্রতিবেশী। সুতরাং মনে রাখবেন, পুলিশ কেইস হতে পারে এমন ঘটনার শিকার কোনো মুমূর্ষু রোগীকে দ্রুত সুচিকিৎসা দিতে প্রথমেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইমার্জেন্সি'তে নিতে হবে।

**দৃশ্যপট ২**

আপনার প্রাণপ্রিয় সন্তান কিংবা অন্য কোনো আপনজনের অপারেশন। এক্ষুণি রক্ত চাই,

কোথায় পাবেন? সজল নামের একটি ছেলের সাথে হাসপাতালের করিডোরে দেখা হলো। ছেলেটি সালাম দিয়ে হয়তো হাসিমুখে আপনাকে বললো, "আপনার রক্ত চাই তো? কোনো চিন্তা নাই, আমার সাথে আসুন"। এই বিপদে আপনি দিশেহারা, উপকারী ছেলেটিকে দেবদূত মনে হচ্ছে আপনার কাছে! অনেক টাকা খরচ করে আনা রক্ত ডিউটিরত ডাক্তার আপনার রোগীর শরীরে দিতে রাজি হচ্ছেন না, কেননা রক্ত 'স্ক্রিনিং' করা নেই অর্থাৎ রক্ত নিরাপদ ও ভালো কি না তা জানা নেই বিধায় তা দেওয়া যাবে না। রক্ত ফেরত দিতে গিয়ে দুর্ব্যবহার পেয়ে ফিরে এলেন। আপনার মানসিক ও আর্থিক ক্ষতির জন্য কাকে দায়ী করবেন? ডাক্তার না পরোপকারী সজলকে? নিশ্চয়ই সজলকে এবং কিছুটা হলেও আপনার অসচেতনতার কারণে নিজেকে!

সজলের মতো অসংখ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মানুষের অজ্ঞতা ও অসহায়ত্বকে পুজি করে ভুয়া 'ব্লাড ব্যাঙ্ক' তৈরি করে হিরোইনখোর কিংবা মারাত্মক রোগাক্রান্ত পেশাদার রক্তদাতাদের নিয়ে অর্থ লিপ্সায় মেতে উঠেছে। ওরা সোহ্‌রাওয়ার্দি হাসপাতালের সামনে কলেজ গেইট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং পিজি হাসপাতালের আশেপাশে সংঘবদ্ধ হয়ে আছে। তাই আপনার রোগীর জরুরি প্রয়োজনে রোগীর মা-বাবা, ভাইবোন, ছেলেমেয়ে কিংবা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের দেহ থেকে রক্ত সংগ্রহের চেষ্টা করুন। একান্তই না-পেলে ঢাকা শহরে এ-লেখায় উল্লেখিত স্বেচ্ছায় রক্তদাতা সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মনে রাখবেন:

- আপনজনকে রক্তদান এক অমূল্য উপহার
- ১৮-৬৫ বছরের যেকোনো সুস্থ ব্যক্তি প্রতি ৪ মাস পরপর রক্ত দিতে পারেন। রক্তদান শরীরের জন্য ভালো
- রক্ত দেবার আগে রক্ত নিরাপদ ও ভালো কি না তা যাচাই করতে হবে। এর জন্য যেসব পরীক্ষা করা উচিত তার মধ্যে রয়েছে; হিমোগ্লোবিন-এর পরিমাণ, দাতা ও গ্রহীতার রক্তের ক্রস-ম্যাচিং, ভিডিআরএল টেস্ট, বি ও সি ভাইরাসের টেস্ট, এইচআইভি টেস্ট, ইত্যাদি
- একান্ত বাধ্য না-হলে কখনো ক্রয়-করা রক্ত আপনার রোগীকে দেবেন না
- রক্তের স্ক্রিনিং টেস্টগুলো করতে ১-২ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। এসময়ে ধৈর্য্যের সাথে অপেক্ষা করুন
- নিজে রক্ত দিন, অপরকে রক্ত দিতে উৎসাহিত করুন। রক্তদান পৃথিবীর সর্বোত্তম মানবসেবা

### রেড ক্রিসেন্ট রক্তকেন্দ্র থেকে রক্ত নিতে যা যা লাগবে

- ডাক্তারের রিক্যুইজিশন ফরম
- রোগীর রক্ত
- রক্তদাতার কার্ড (যদি থাকে)
- সামান্য টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা:
৭/৫ আওরঙ্গজেব রোড, ঢাকা
(রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের দক্ষিণ দিকের রাস্তায়)
ফোন: ৮১২১৪৯৭

### ভেতরের পাতায়

শব্দ দূষণের ফলে কানে কম-শোনা ২

জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব থেকে স্বাস্থ্য রক্ষা ৪

যক্ষা কোনো মারাত্মক রোগ নয় ৫

আইসিডিডিআর,বি-তে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য-বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত ৬

বেবি জিঙ্ক দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ৭

icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, এইচআইভি/এইডস্, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামোও আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিস্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

## স্বাস্থ্য সংলাপ

**সম্পাদনা পরিষদ**

| | |
|---|---|
| প্রধান সম্পাদক | আলেহান্দ্রো ক্র্যাভিওটো |
| উপ-প্রধান সম্পাদক | প্রদীপ কুমার বর্ধন |
| ব্যবস্থাপনা সম্পাদক | এম শামসুল ইসলাম খান |
| সম্পাদক | এম এ রহিম |

**সদস্য**

আসেম আনসারী, রুখসানা গাজী, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ ইকবাল, মাসুমা আক্তার খানম, মোঃ আনিসুর রহমান ও রুবহানা রকিব

| | |
|---|---|
| পৃষ্ঠাবিন্যাস | সৈয়দ হাসিবুল হাসান |
| কম্পোজ | হামিদা আক্তার |

**কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন**

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমুহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা ব্যবস্থাপনা সম্পাদক বরাবর ইংরেজিতে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

**প্রকাশক**

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৮৮৬০৫২৩-৩২
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: msik@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: সেবা প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, ফোন: ৯১১১৪৩৩

## কোয়ান্টাম রক্তকেন্দ্র থেকে রক্ত নিতে যা যা লাগবে

- ডাক্তারের রিক্যুইজিশন ফরম
- রোগীর রক্ত
- কিছু টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা:
কোয়ান্টাম ভবন, ১১৯ মালিবাগ, ঢাকা
ফোন: ৯৩৫১৯৬৬, ৮৩২২৯৮৭

## সন্ধানী স্বেচ্ছায় রক্তদান কেন্দ্র থেকে রক্ত নিতে যা যা লাগবে

- রোগীর রক্ত
- ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন
- সামান্য টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা:
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ইউনিট, মীরপুর ১৪, ঢাকা
ফোন: ৯০১১৮৮৭
ঢাকা মেডিকেল কলেজ
ফোন: ৯৬৬৮৬৯০
স্যার সলিমুল্লামডিকেল কলেজ
ফোন: ৭৩১৯১২৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাধন' নামে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের একটি বৃহৎ সংগঠন আছে। এর সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা:

টিএসসিসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো ছাত্রাবাসেই এর শাখা আছে। তবে টিএসসি-তে সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত অফিস খোলা থাকে। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নিয়ে গেলেই হাসিমুখে রক্তদাতা এসে রক্তদান করে যাবে। সময় থাকলে ওদের ওয়েবসাইট www.badhan.org-এর মাধ্যমেও যোগাযোগ করা যেতে পারে। ■

# শব্দ-দূষণের ফলে কানে কম-শোনা

**মুহঃ শামীম বিন সাঈদ খান**
ঢাকা মেডিকেল কলেজ
**মোঃ ইকবাল**
আইসিডিডিআর,বি

ত্রিশোর্ধ বয়সের মাহমুদ সাহেব একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার। একটি টেক্সটাইল ফ্যাক্টরির গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত আছেন। তাঁকে মেশিনারী-সংক্রান্ত জিনিসপত্র দেখভালের পাশাপাশি কর্মচারীদের কাজের তদারকিও করতে হয়। এজন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি তাঁকে ফ্যাক্টরিতেই থাকতে হয়। তিনি অত্যন্ত সদালাপী ও মিষ্টভাষী ছিলেন, কিন্তু ইদানীং তাঁর ব্যবহার ও আচার-আচরণে বেশকিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। তিনি এখন আর আগের মতো হাস্যোজ্জল ও আলাপী নন। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে কারো সাথে কথা বলেন না। কথা বললেও কেমন যেন অসংলগ্ন মনে হয়। একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে অন্য কিছুর উত্তর দেন। তাঁর স্ত্রীর অভিযোগ ইদানীং বাসায় তিনি সবসময় চুপচাপ থাকেন। বাসায় বসে উচ্চশব্দে শুধু টেলিভিশন দেখেন। কোনো পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে চান না। কয়েকদিন আগে দিনের বেলায় বাসায় ফেরার পথে রাস্তা পারাপারের সময় একটি প্রাইভেট মোটরকারের ধাক্কায় তিনি আহতও হয়েছিলেন।

মাহমুদ সাহেবের আচার-আচরণে এই পরিবর্তনের মূল কারণ শব্দ দূষণের ফলে তাঁর শ্রবণশক্তি হ্রাস পেয়েছে।

দীর্ঘদিন উচ্চমাত্রার শব্দে কাজ করার জন্য তাঁর অন্তঃকর্ণের কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদের কথাবার্তা ও তাঁর পরিপার্শ্বের কোনো শব্দ বুঝতে পারেন না কিংবা শুনতে পান না বলেই বেশিরভাগ সময় চুপচাপ থাকেন। তিনি মোটরকারের ধাক্কায় আহত হয়েছেন কারণ হর্ন বাজানো হলেও আসলে তা তিনি শুনতে পান নি অথবা শুনলেও শব্দটা কোনদিক থেকে এসেছিলো তা বুঝতে পারেন নি।

## আমরা কীভাবে কানে শুনে থাকি

শ্রবণযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত কানের অংশগুলোকে নিম্নোক্ত তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

১. *বহিঃকর্ণ (outer ear)*: বহিঃকর্ণের মধ্যে রয়েছে পিনা (pinna) ও বাইরের পরিবেশের সাথে মধ্যকর্ণের সংযোগ-নালী (external auditory canal)

২. *মধ্যকর্ণ (middle ear)*: কানের এ-অংশে রয়েছে মেলিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস নামের

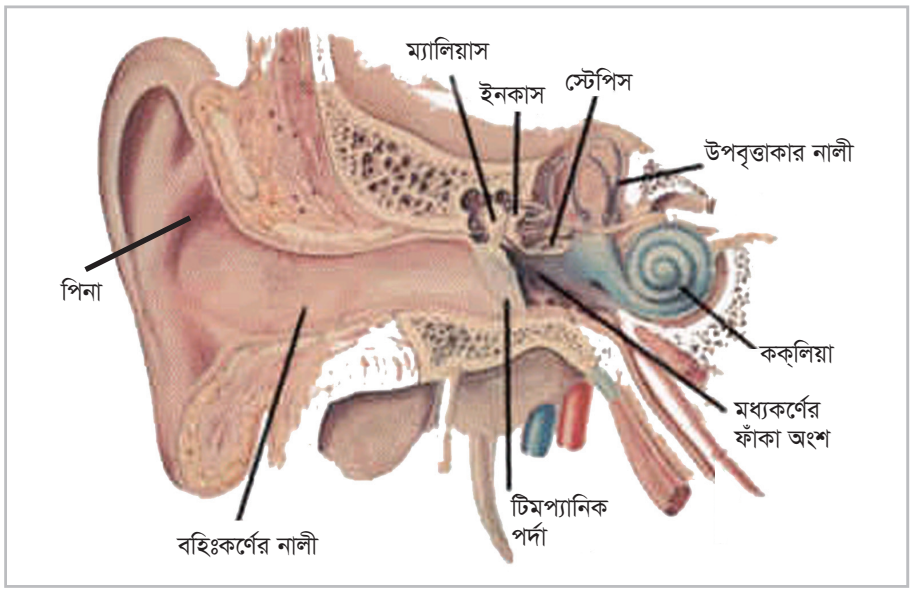


তিনটি ছোট্ট হাড়। এগুলো একেকটা আরেকটার সাথে সুষমভাবে সংযুক্ত থেকে tympanic membrane-নামক একটি পর্দার সাথে অন্তঃকর্ণের সংযোগ স্থাপনের কর্মটি সম্পাদন করে।

৩. *অন্তঃকর্ণ (inner ear)*: অন্তঃকর্ণে inner and outer hair-cell বা শ্রবণকোষ, perilymph এবং endolymph-নামক কিছু তরল পদার্থসহ অন্য কিছু উপাদান শ্রবণযন্ত্রের সার্বিক ভারসাম্য রক্ষার কাজটি সম্পন্ন করে।

বাইরের শব্দতরঙ্গ প্রথমে বহিঃকর্ণের পিনা-নামক অংশটি গ্রহণ করে। সংযোগ-নালীর মাধ্যমে এই শব্দতরঙ্গ টিমপেনিক পর্দায় আন্দোলনের সৃষ্টি করে। সেখান থেকে মধ্যকর্ণের হাড়ের ভিতর দিয়ে তা অন্তঃকর্ণে চলে যায়। অন্তঃকর্ণের শ্রবণকোষ আন্দোলিত হওয়ার পর সেখানে স্নায়বিক শব্দ-পরিবহনের প্রক্রিয়া তৈরি হয় তা নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্কে গিয়ে শব্দের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

## কীভাবে শব্দ-দূষণ হয়ে থাকে

শব্দ-দূষণের কারণে শ্রবণশক্তি হ্রাস অথবা লোপ পায় মূলত দুইভাবে: (১) হঠাৎ উচ্চমাত্রার শব্দ শোনার ফলে (acoustic trauma) এবং (২) উচ্চমাত্রার শব্দ হয় এমন স্থানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করলে।

## শ্রবণশক্তির ওপর হঠাৎ উচ্চমাত্রার শব্দ শোনার প্রভাব

হঠাৎ উচ্চমাত্রার শব্দ কানে প্রবেশ করলে অন্তঃকর্ণের শব্দগ্রহণ-কোষের স্থায়ী ক্ষতি সাধিত হতে পারে। এধরনের শব্দের মাত্রা ১৪০ ডেসিবলের বেশি হয়ে থাকে। বোমা বিস্ফোরণ,বন্দুকের গুলি, ফায়ার ক্রেকার, ইত্যাদির ক্ষেত্রে ১৪০ থেকে ১৭০ ডেসিবল মাত্রার শব্দ তৈরি হয়।

হঠাৎ উচ্চমাত্রার শব্দের জন্য প্রথমে বাতাসে ধনাত্মক চাপ (positive pressure) তৈরি হয়। এতে কানের পর্দা, মধ্যকর্ণের হাড়ের জোড়াগুলো বিচ্ছিন্ন হতে পারে অথবা হাড়গুলোর ক্ষতি সাধিত হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কানে কম শুনতে পারেন। বাতাসে ধনাত্মক চাপের পরপরই ঋণাত্মক চাপ (negative pressure) তৈরি হয়। এতে অন্তঃকর্ণের শ্রবণকোষগুলো স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

## উচ্চমাত্রার শব্দ হয় এমন স্থানে দীর্ঘদিন অবস্থান করলে যা ঘটে

বারবার মিউজিক্যাল কনসার্ট, উচ্চমাত্রার মিউজিক বাজে এমন নাইট ক্লাবে ঘনঘন যাতাযাত ও অবস্থান করলে ১১০-১২০ ডেসিবল মাত্রার শব্দ কানে প্রবেশ করে। টেক্সটাইল কারখানা, পাথর-কাটার কারখানা, মেটাল ওয়ার্ক ও কাঠ-কাটার কারখানায় যে বিকট শব্দ হয় তা শ্রবণযন্ত্রের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এছাড়াও, খনন কাজ, মুদ্রণযন্ত্র চালনা ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের শ্রবণযন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। উচ্চমাত্রার শব্দবিশিষ্ট ব্যক্তিগত মিউজিক ডিভাইসও এক্ষেত্রে উল্লেখ্য।

৮৫ থেকে ৯০ ডেসিবল শব্দ তৈরি হয় এমন কর্মস্থলে ৬-৮ ঘণ্টার বেশি সময় অবস্থান করলে যে শব্দ-দূষণ সৃষ্টি হয় তাতে প্রাথমিকভাবে অস্থায়ীভাবে এবং পরে ধীরে ধীরে স্থায়ীভাবে কানে কম-শোনার সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

## প্রতিরোধের উপায়

যেকেউ ইচ্ছা করলেই খুব সহজে উচ্চমাত্রার শব্দ-দূষণ থেকে শ্রবণযন্ত্রকে রক্ষা করতে পারে। এজন্য দরকার: (১) নিজের কানের মধ্যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা (ear protection); (২) কীভাবে উচ্চমাত্রার শব্দ কানের ক্ষতি করে এবং কীভাবে এর প্রভাব থেকে আমাদের কানকে রক্ষা করা যায় এ-বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা; এবং (৩) শ্রবণশক্তি ধরে রাখার ব্যবস্থা (hearing conservation programme) গ্রহণ করা।

উচ্চমাত্রার শব্দ-দূষণ থেকে কানকে রক্ষা করার জন্য আমরা কানে প্লাগ/মাফল (ear-plug/ear-muffle) ব্যবহার করতে পারি। এতে শব্দের মাত্রা ১০ থেকে ১৫ ডেসিবল পর্যন্ত কমে যাবে। এছাড়া, যেসব যন্ত্র উচ্চমাত্রার শব্দ তৈরি করে সেগুলোকে এমন একটি পদ্ধতির মধ্যে নিয়ে আসা যায় যাতে অসহনীয় মাত্রার শব্দ তৈরি না-হয়। বাস বা ট্রাকে প্রায়ই দেখা যায়, হাইড্রোলিক (hydraulic) হর্ন ব্যবহার করা হয়। ট্রাফিক আইনে নিষিদ্ধ হলেও এধরনের উচ্চ শব্দবিশিষ্ট হর্ন আমরা প্রায়ই রাস্তায় শুনে থাকি। এধরনের হর্ন ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করতে হবে। হাইড্রোলিক হর্ন শুধু কানের ক্ষতিই করে না, আমাদের হৃদপিণ্ডেরও ক্ষতিসাধন করে। এমনকি এতে হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ঢাকা শহরের বাংলামোটর এলাকায় ১০৪ ডেসিবল মাত্রার শব্দ শোনা যায়, যার প্রায় সবটাই যানজট-কবলিত গাড়ির হর্ন থেকে সৃষ্টি হয়।

উচ্চমাত্রার শব্দ হয় এমন কল-কারখানায় নিয়োজিত প্রত্যেক কর্মচারী-কর্মকর্তাকে নিয়োগের আগে এবং পরবর্তী কালে নিয়মিতভাবে অডিওগ্রাম পদ্ধতিতে কানের পরীক্ষা করাতে হবে। যদি কখনও পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তবে খুব দ্রুত এর জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিনোদন আমাদের কাজকর্মে উদ্দীপনা জোগায় ও জীবনীশক্তি বাড়িয়ে দেয়। তাই বলে বিনোদনের নামে এমন কিছু করা ঠিক নয় যা আমাদের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয় ও জীবনীশক্তি হ্রাস করে দেয়। উচ্চমাত্রার শব্দ হয় এমন মিউজিক্যাল কনসার্টে অংশগ্রহণ কিংবা কানে এয়ারফোন লাগিয়ে উচ্চশব্দে গান শোনাও পরিহার করতে হবে।

উচ্চমাত্রার শব্দ-দূষণের কারণে প্রথমত অন্তঃকর্ণের শ্রবণ-কোষের অস্থায়ী ক্ষতি হলেও একইভাবে দীর্ঘ সময় চলতে থাকলে শ্রবণ-কোষের স্থায়ী ক্ষতি সাধিত হতে পারে। মনে রাখতে হবে: শ্রবণ-কোষ এবং স্নায়ুর স্থায়ী ক্ষতি সাধিত হলে কানে-শোনার যন্ত্র (hearing aid) ব্যবহার করেও তেমন ফল পাওয়া যাবে না। তখন আক্রান্ত ব্যক্তিকে শব্দহীন এক বিষাদময় জগতে বসবাস করতে হবে; কাছের মানুষকেও কাছের মনে হবে না: অনেক ক্ষেত্রে অন্যদের সাথে যোগাযোগ হবে লেখনীর মাধ্যমে। এজন্য আমাদের শ্রবণযন্ত্রকে রক্ষা করতে আগেভাগেই ব্যবস্থা নিতে হবে। ■

প্রথম আলো-আইসিডিডিআর,বি গোলটেবিল বৈঠক

# জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব থেকে স্বাস্থ্য রক্ষা

প্রথম আলো-আইসিডিডিআর,বি গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ (ছবি: ফকরুল আলম)

১৭ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে আইসিডিডিআর,বি-র সাসাকাওয়া মিলনায়তনে এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আইসিডিডিআর,বি ও প্রথম আলো যৌথভাবে এই বৈঠকের আয়োজন করে। এবারকার বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই বৈঠকে আলোচনার বিষয় ছিলো 'জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব থেকে স্বাস্থ্য রক্ষা'। বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব একেএম জাফর উল্লাহ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন দু'জন: বাংলাদেশস্থ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রধান জনাব আবদুল কুদ্দুস এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিবেশগত স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ড. এনড্রু ট্র্যাভেট।

আইসিডিডিআর,বি-র নির্বাহী পরিচালকের পক্ষে কেন্দ্রের অন্যতম পরিচালক ড. হিউবার্ট এন্ডজ্ উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেন: "মাঠ-পর্যায় থেকে জনস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আইসিডিডিআর,বি-তে বিভিন্ন কর্মসূচি বিদ্যমান। কিন্তু এসব রোগব্যাধি ও মৃত্যু জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত সমস্যার ফলে ঘটছে কি না তা জানার উপায় নেই। তবে লক্ষ করা গেছে: বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে রোগব্যাধি অনেক ক্ষেত্রেই ঋতু-নির্ভর যেখানে ক্ষণস্থায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি জড়িত। বন্যা ও সাইক্লোন গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে ঘটে এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রোগব্যাধি ও মৃত্যুর একটি নিবিড় সম্পর্কসূত্র রয়েছে। ঋতু-ভিত্তিক পরিবর্তন ছাড়াও বৈশ্বিক জলবায়ুর যে পরিবর্তন ঘটছে তা অত্যন্ত ধীরগতিসম্পন্ন। এর প্রভাবে সৃষ্ট রোগব্যাধিও তেমনি কিছুটা ভবিষ্যতের ব্যাপার। আমরা আশা করছি আইসিডিডিআর,বি আগামী তিন বছরের মধ্যে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত স্বাস্থ্যসমস্যা-সংক্রান্ত একটি তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।"

ড. এন্ডজ্-এর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পালা শেষ হলে প্রথম আলোর সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান আলোচ্য মূল বিষয়ে প্রবেশের জন্য তাঁর সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এর পর একে একে আইসিডিডিআর,বি-র বিজ্ঞানী ড. মনিরুল আলম, রাশিদুল হক, সিরাজুল ইসলাম, মুহম্মদ ইউনুস, বিশেষ অতিথিদ্বয় এবং প্রধান অতিথি আলোচ্য বিষয়ের ওপর তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন।

ড. মুনিরুল আলম তাঁর উপস্থাপনায় বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তন-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক দিকগুলো তুলে ধরেন। অ্যাল-নিনো, লা-নিনা, গ্রীন হাউজ ইফেক্ট, ইত্যাদি বিশদভাবে ব্যাখা করেন এবং এর ফলে পরিবেশে কীধরনের বিপর্যয় ঘটে চলেছে এবং জনস্বাস্থ্যের ওপর এর বিরূপ প্রভাব কীভাবে এবং কতটা পড়তে পারে সে-সম্পর্কে আলোচনা করেন। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে যে পরিবর্তন ঘটছে তাতে ভবিষ্যতে অতিবৃষ্টি, অতিমাত্রায় বরফের গলন, সুমদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, বন্যা, খরা, ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনা ত্বরান্বিত হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, পরিবেশ দূষণের সঙ্গে পানি ও প্রাণীবাহিত জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট রোগব্যাধির প্রকোপ বেড়ে যাবে। এসব থেকে প্রকৃতি ও জনস্বাস্থ্যকে রক্ষার জন্য তিনি বনায়ন-কার্যক্রমে বর্ধিত হারে সবুজ বৃক্ষ রোপন নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত এসব বিপদ থেকে উত্তরণ সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

ড. রাশিদুল হক তাঁর উপস্থাপনায় জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন প্রাণীবাহিত জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট রোগ, বিশেষ করে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ফাইলেরিয়া ও ডেঙ্গু-সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মায়ানমার ও ভারতের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের ১৩টি জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, সুদান ও ব্রাজিলে কালাজ্বর নতুন করে দেখা দিচ্ছে। জীবাণু সনাক্তকরণে এখন আর মাইক্রোস্কোপের মতো পুরানো যন্ত্রের ব্যবহার পরিপূর্ণভাবে কার্যকর নয় বলে এ-কাজের জন্য এখন যেসব নতুন পদ্ধতি রয়েছে তার বিশেষ দিকগুলো তিনি তুলে ধরেন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় আইসিডিডিআর,বি-র সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

কলেরা রোগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, জলবায়ুর পরিবর্তন কীভাবে কলেরার প্রাদুর্ভাবের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং কীভাবে এ-রোগের বিস্তার ঘটে, কলেরার ওপর প্রকৃতির কী প্রভাব আছে–এসব বিষয়ে আলোকপাত ক'রে এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে কলেরা রোগের ভবিষ্যত গতি-প্রকৃতি তুলে ধ'রে আইসিডিডিআর,বি-র পরিবেশ বিজ্ঞানী ড. সিরাজুল ইসলাম বলেন: "পৃথিবীর অনেক দেশে কলেরা রোগটি দেখা দিলেও মহামারীর দীর্ঘসূত্রিতা এবং প্রতিবছর গ্রীষ্ম ও শীতকালে এর আবির্ভাবের কারণে বাংলাদেশ 'কলেরার মাতৃভূমি' হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। দুই মহামারীর মধ্যবর্তী সময়ে কলেরার জীবাণু লুকিয়ে থাকে 'ব্লু-গ্রীন অ্যালগী' নামের একধরনের জলজ শ্যাঁওলার মধ্যে যা বিল-ঝিলে ভরা বাংলাদেশেই বেশি জন্মে। পরিবেশের তাপমাত্রার ওপর নির্ভর ক'রে এই নীলাভ সবুজ শ্যাঁওলার বৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে এই ব্যাকটেরিয়া বিস্তার লাভ করবে। যখন নীলাভ সবুজ শ্যাঁওলা বেশি জন্মে তখন কলেরার প্রাদুর্ভাবও বেড়ে যায়।

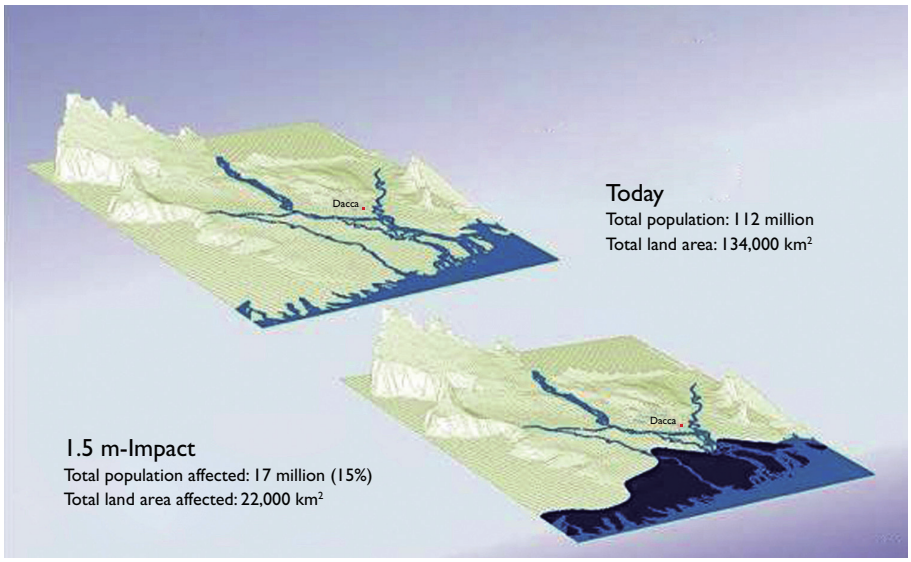


সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে। এর ফলে যা ঘটতে পারে তা ছবিতে দেখুন (সূত্র: ইউএনইপি/জিআরআইডি জেনেভা; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; জেআরও মিউনিখ; বিশ্ব ব্যাংক; ওয়ার্ল্ড রিসোর্স ইন্সটিটিউট, ওয়াশিংটন, ডিসি)

ঘনঘন বন্যার ফলে এই সবুজ শ্যাঁওলাযুক্ত পানি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে; বিশুদ্ধ পানির অভাব দেখা দেয়। অতএব কলেরা নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় হলো বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করা। পানি বিশদ্ধিকরণের জন্য আমাদেরকে সহজলভ্য পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে।"

ভবিষ্যতে গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়নে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত প্রভাব ব্যাখ্যা করে আইসিডিডিআর,বি-র প্রবীণ বিজ্ঞানী ড. মোহাম্মদ ইউনুস বলেন, "জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ে জতিসংঘ একটা সংজ্ঞা দিয়েছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের নানা কর্মকাণ্ড দ্বারা জলবায়ুতে যে পরিবর্তন ঘটছে তাকেই এই সংজ্ঞায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে জলবায়ুর যে পরিবর্তন ঘটে সেটা খুব ধীরগতিসম্পন্ন হয়ে থাকে। দশক, শতক, এমনকি তার চেয়েও অনেক বেশি সময় নিয়ে তা ঘটে। জলবায়ুর পরিবর্তন হয়তো শত সহস্র বছরে অনেক হয়েছে, কিন্তু গত তিন-চার দশকে, বিশেষ করে সত্তরের দশক থেকে যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে সেগুলোই আমাদের ভাবিয়ে তুলছে। শিল্পায়নসহ মানবজাতির নানামুখি কর্মকাণ্ডের ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে; বরফ গলার গতি বেড়েছে; এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন জনস্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে—এই সচেতনতা এখন পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নয়নশীল বিশ্বে শিল্পায়ন অত্যন্ত ধীর গতিতে হচ্ছে বলে জলবায়ুর এই পরিবর্তনের জন্য উন্নত দেশগুলোই বেশি দায়ী। জলবায়ুর পরিবর্তন সরাসরি আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। তাপমাত্রা অনেক বেড়ে গেলে পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে বন্যা ও সাইক্লোনে সরাসরি মানুষ মরতে পারে। পরোক্ষভাবে এর ফলে প্রাণীবাহিত জীবাণুর বিস্তার ঘটবে এবং নানা রকম সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। আমরা শুনেছি বরিশালসহ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল পানির নিচে চলে যেতে পারে। পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পাবে। ফসলহানির কারণে খাদ্যাভাব ও অপুষ্টি দেখা দিবে। এসব কারণে আমাদের গবেষণা কর্মসূচিতে জলবায়ুর পরিবর্তনের বিষয়টি অঙ্গীভূত করতে হবে। জলবায়ুর পরিবর্তনকে আমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারবো না। কিন্তু এর বিরূপ প্রভাব থেকে বাঁচার উপায় উদ্ভাবন করতে পারলে আসন্ন বিপদ থেকে আমরা উদ্ভিদ, প্রাণীকুল ও মানবজাতিকে রক্ষা করতে পারবো। বেশি পরিমাণে এয়ার কন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে পরিবেশে ক্লোরোফ্লোরোকার্বন গ্যাস বেড়ে চলেছে; বায়ুদূষণের ফলে হাঁপানিসহ অনেক রোগ দেখা দিচ্ছে। মাঠ-পর্যায়ে এসব রোগের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে বিষয়গুলোকে আমাদের গবেষণা কর্মসূচিতে অঙ্গীভূত করতে হবে। এজন্য সরকারের আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।"

বিশেষ অতিথি ড. এনড্রু ট্র্যাভেট বলেন: "এই গোলটেবিল বৈঠকে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় আমি একে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি। এর কারণ অনেকদিন ধরে একটি বিশ্বাস প্রচলিত ছিলো যে, উদ্ভূত সমস্যাগুলোর সমাধান দিবেন কেবল পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। বিষয়টি এখন অনেক বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। তবুও সাইক্লোন কিংবা বন্যা হলেই কেবল আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি। যদিও এসব দুর্যোগকালীন সময়ে কিছু কিছু রোগব্যাধির ক্ষেত্রে বিষয়টি প্রাধান্য পায়, বাস্তবে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত স্বাস্থ্যসমস্যা এতই ব্যাপক হয়ে উঠেছে যে, সংক্রামক নয় এমন অনেক রোগ এবং অপুষ্টিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এমনকি জীবনধারণের প্রয়োজনে যে অভিবাসন প্রক্রিয়া চলছে অনেক ক্ষেত্রেই জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে তারও একটা নিবিড় সম্পর্ক ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এবছরের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 'জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব থেকে স্বাস্থ্য রক্ষা'র সঙ্গে এই বৈঠকে আলোচ্য বিষয়ের মিল দেখে আমি অভিভুত হয়েছি। এই বৈঠক থেকে প্রাপ্ত তথ্য আমি অন্যত্রও কাজে লাগাতে পারবো। জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত প্রভাব থেকে স্বাস্থ্য রক্ষা-বিষয়ক চলমান এই সংলাপ গণসচেতনতা তৈরি এবং একই সঙ্গে নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়ক হবে। গত নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত একটি কর্মশালায় প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিলো বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত রোগব্যাধির প্রকোপ হ্রাসকল্পে জাতীয় কর্মসূচির রূপরেখা প্রণয়ন। এই কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার নির্ধারণ, বাস্তবধর্মী ও সাশ্রয়ী পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয় এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ও জনগোষ্ঠি চিহ্নিত করাসহ এই কর্মসূচিতে আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতার বিষয়টিকে বড় করে দেখা হয়। প্রস্তাবিত কর্মসূচিকে আরো বেশি পরিশুদ্ধ করার তাগিদে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে সমন্বিত করে বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হবে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের যৌথ উদ্যোগে একটি কনফারেন্স ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। মে মাসে লন্ডনেও এধরনের একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি কনফারেন্সেই জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত বিরূপতা কতটা স্বাস্থ্যহানিকর হতে পারে তা গুরুত্ব পাবে।"

একটি রিপোর্টের কথা উল্লেখ করে ড. ট্র্যাভেট আরো বলেন, "পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আমাদেরকে তৈরি হতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশ সরকারকে এ-বিষয়ে সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। রোগব্যাধি-সংক্রান্ত সমীক্ষা, প্রাণীবাহিত জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট রোগব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আগাম প্রস্তুতি এবং পরিবেশগত স্বাস্থ্যসমস্যার ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।" ■

*[বাকি অংশ আগামী সংখ্যায় পড়ুন]*

# যক্ষা কোনো মারাত্মক রোগ নয়

**সৈয়দ রেজাউল হক**
আয়েশা মেমোরিয়েল হাসপাতাল, ঢাকা
**সিরাজ উদ্দীন আহমেদ**
আইসিডিডিআর,বি

ছোটবেলায় বই-পুস্তকে পড়েছিলাম ''যার হয় যক্ষা, তার নাই রক্ষা''! সেই ভয়ঙ্কর বাক্যটি আজও আমার মনে বাজে। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এই স্বর্ণযুগে যক্ষা একটি সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য রোগ।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে দুরারোগ্য যক্ষার সকল নিরাময়-কৌশল বর্তমানে আবিস্কৃত হয়েছে। উন্নত বিশ্বে যক্ষায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা নগণ্য হলেও আমাদের দেশে এ-রোগের প্রকোপ এখনও কমে নি। মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারক্যুলোসিস নামের একপ্রকার জীবাণু থেকে এ-রোগের সৃষ্টি হয়।

আক্রান্ত রোগীর কফ ও হাঁচি-কাশি থেকে এ-রোগের জীবাণু একজনের শরীর থেকে আরেকজনের শরীরে ছড়ায়। এ-রোগের নির্দিষ্ট কোনো সুপ্তিকাল নেই। আক্রান্ত রোগীর বয়স, দৈহিক রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং জীবাণুর শক্তির ওপর সুপ্তিকাল নির্ভর করে। তবে, সাধারণত দেহে জীবাণু প্রবেশের ১ মাস থেকে ৩ মাসের মধ্যে রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। কিন্তু জীবাণু প্রবেশের কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক বছরের মধ্যেও এ-রোগ হতে পারে।

যক্ষা সাধারণত ফুসফুসে হয়। কিন্তু ফুসফুস ছাড়াও লসিকা-গ্রন্থি, হাড়, হাড়ের সন্ধিস্থল, মস্তিষ্কের আবরণী, কিডনী, অন্ত্র, জরায়ু এবং ত্বকেও যক্ষা হতে পারে। যক্ষা রোগের জীবাণু শ্বাসনালী অথবা পরিপাকতন্ত্রের নালীর দ্বারা দেহে প্রবেশ করে। আক্রান্ত রোগীর কাশি বা হাঁচির সঙ্গে যক্ষা রোগের জীবাণু শরীর থেকে বেরিয়ে আসে। কফের বড় ও ভারী অংশগুলো মাটিতে ধুলিকণার সঙ্গে মিশে যায়। এই ধুলিকণা-মিশ্রিত কফের বিন্দুগুলো বাতাসে ভেসে বেড়ায় এবং সুস্থ ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে ফুসফুসে প্রবেশ করে।

সামান্য জ্বর এবং কাশির উপসর্গ নিয়ে যক্ষা শুরু হয়। এর সাথে খাবারে অনীহা, অতিরিক্ত ঘাম, কফ-কাশির সাথে রক্ত-যাওয়া, শরীরের ওজন কমে-যাওয়া–এগুলো যক্ষা রোগের প্রধান উপসর্গ। এ-রোগে শরীরের তাপমাত্রা সাধারণত বিকাল থেকে রাতের প্রথমভাগে বেড়ে যায়।

যক্ষা অত্যন্ত সংক্রামক একটি রোগ। তবে, সব ধরনের যক্ষার রোগী থেকে এ-রোগ ছড়ায় না। যাদের কাছ থেকে যক্ষা রোগ ছড়ায় তাদের 'ওপেন কেস' বলা হয়। এদের কফে যক্ষার জীবাণু পাওয়া যায়। এদের কফ ও হাঁচি-কাশি থেকেই জীবাণু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। তাই এদের সঙ্গে চলাফেরা ও বসবাস অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। অবশ্য রোগীর থালা, গ্লাস এবং কাপড়-চোপড়ের মাধ্যমে রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। যেসব রোগীর কফ বারবার পরীক্ষার পরও কোনো জীবাণু পাওয়া যায় না, তাদের সঙ্গে সুস্থ লোক চলাফেরা ও বসবাস করলেও রোগাক্রান্ত হওয়ার কোনো ভয় নেই। রোগীর কফে যক্ষার জীবাণু পাওয়া না-গেলে রোগীকে আলাদা ঘরে রাখার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।

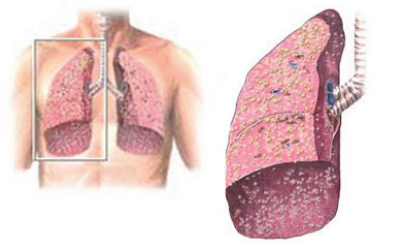

মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারক্যুলোসিস জীবাণুর দ্বারা সৃষ্ট যক্ষা রোগীর ফুসফুসে দানা-দানা ক্ষত তৈরি হয়

যক্ষা-আক্রান্ত রোগীর ফুসফুসের এক্স-রে চিত্র

যক্ষা রোগের চিকিৎসা বেশ দীর্ঘ-মেয়াদী। যক্ষা হলে সাধারণত ৬ থেকে ৯ মাস অষুধ খেতে হয়। এ-রোগের চিকিৎসার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হলো: বিভিন্ন কারণে রোগী অষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেয়। চিকিৎসা শুরু করে বন্ধ করে দেওয়ার হার আমাদের দেশে অনেক বেশি। এভাবে বারবার অষুধ শুরু এবং বন্ধ করার ফলে চিকিৎসায় ব্যবহৃত অষুধের বিরুদ্ধে যক্ষার জীবাণু প্রতিরোধ-ক্ষমতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ফলে এসব অষুধ অকার্যকর হয়ে পড়ে। তাই এখনই আমাদের ব্যাপকভাবে সচেতন ও তৎপর হতে হবে যাতে অষুধ-প্রতিরোধী জীবাণুঘটিত যক্ষার বিস্তার কমিয়ে আনা যায়। সেজন্য প্রয়োজন রোগীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পূর্ণমাত্রায় নিয়মিত অষুধ সেবনে উদ্বুদ্ধ করা।

মনে রাখতে হবে: সঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে এখন সব ধরনের যক্ষার নিরাময় সম্ভব। তবে, বিরতি দিয়ে অপর্যাপ্ত অষুধ সেবন করলে আমাদের ছোটবেলার সেই প্রবাদ 'যার হয় যক্ষা, তার নাই রক্ষা' পুনরায় সত্য প্রমাণিত হতে পারে অর্থাৎ রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে। ■

# আইসিডিডিআর,বি-তে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য-বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত বছরের শেষদিকে আইসিডিডিআর,বি-তে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য উপস্থাপনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিলো "লৈঙ্গিক, পারিবারিক ও সামাজিক গতিধারা এবং বাংলাদেশ ও ভারতের প্রেক্ষাপটে মাতৃস্বাস্থ্য ও নবজাতকের কম জন্ম-ওজনের সঙ্গে এর সম্পর্ক"।

দিনব্যাপী এই সেমিনারে আইসিডিডিআর,বি-র ড. রুচিরা তাবাসসুম নাভেদসহ ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের অনেক গবেষক উপরোক্ত বিষয়ে তাঁদের গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল পরিবেশন করেন। এদের মধ্যে ছিলেন ফাউন্ডেশন ফর রিসার্চ ইন হেলথ সিস্টেমস (এফআরএইচএস)-এর ড. অলকা বড়ুয়া, ইনস্টিটিউট অব হেলথ ম্যানেজমেন্ট, পাচদ (আইএইচএমপি)-এর মিস মনীষা খালে, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর রিসার্চ অন উইমেন (আইসিআরডব্লিউ)-এর ড. কবিতা সেথুরমন ও মিস সারাঙ্গা জৈন। আইসিডিডিআর,বি-র নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর আলেহান্দ্রো ক্র্যাভিওটো সেমিনারে উপস্থিত সবার উদ্দেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

গবেষকদের উপস্থাপিত তথ্যের মধ্যে ছিলো ভারত ও বাংলাদেশে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ-সংক্রান্ত আচরণ, সেবাদান ও সহায়তা, শিক্ষা গ্রহণ বনাম অবিবাহিত কিশোর-কিশোরীদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, বিয়ের বয়স ও প্রথম সন্তান ধারণ বিষয়ে তাদের নিজস্ব মতামত প্রদানের ক্ষমতা, শারীরিক নির্যাতন, কাজের চাপ, খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্য বন্টন-প্রক্রিয়া, এবং নববিবাহিতা কিশোরী মায়েদের স্বাস্থ্যসেবার ধরন এবং শিশুর সঠিক জন্ম-ওজনের ওপর এসবের প্রভাব।

## অবিবাহিতা কিশোরীদের অবস্থা

সেমিনারে পরিবেশিত তথ্যে আইসিডিডিআর,বি-র ড. রুচিরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কিশোরীদের মধ্যে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে তাদের অভিভাবকগণ প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা দানকারীর চেয়ে বহুকালব্যাপী প্রচলিত স্থানীয় কবিরাজ ও বৈদ্যের শরণাপন্ন হন বেশি। কিশোরীদের জন্যও আধুনিক ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করার জন্য তিনি অভিভাবকদের

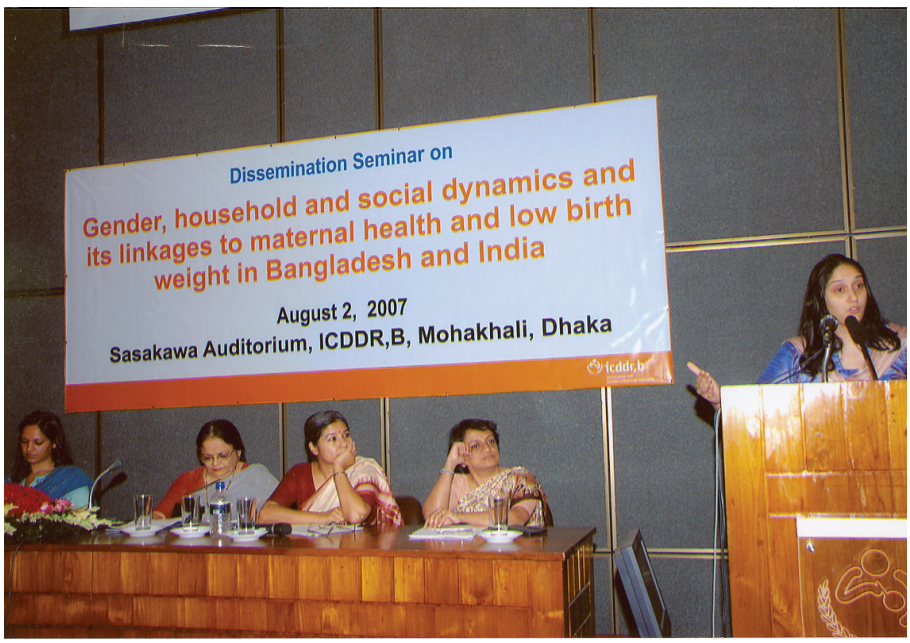


পরামর্শ দেন। ড. অলকা বড়ুয়া তাঁর গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে জানান, অনেক ক্ষেত্রেই অবিবাহিতা কিশোরীগণ তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা ও সহায়তা পেয়েছে, তবে ভারতের রাজস্থানে দেখা গেছে, বেশি লেখাপড়া-জানা মেয়েরা স্বল্পশিক্ষিতদের তুলনায় বেশি সেবা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ-অঞ্চলে অবিবাহিতা কিশোরীদের জন্য স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সুবিধাগুলো গ্রহণের প্রবণতা রয়েছে কারণ অভিভাবকগণ তাদের মেয়েদের স্বাস্থ্যসেবা ও মঙ্গলের ব্যাপারে সচেতন। মিস সারাঙ্গা জৈন ও মনীষা খালে জানিয়েছেন, মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে বাল্যবিবাহের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ভারতের রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রে এবং বাংলাদেশে দেখা গেছে, যেসব অভিভাবক মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে সম্যকভাবে অবহিত তারা তা নিশ্চিত করতে আগ্রহী।

## নববাহিতা কিশোরীদের অবস্থা

ড. সেথুরমন তাঁর গবেষণার ফলাফল পরিবেশন করতে গিয়ে বলেন, অনেক একান্নবর্তী বা বড় পরিবারের সদস্যরা মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে মা-বাবার ওপর চাপ প্রয়োগ করেন। প্রথম গর্ভধারণ বিলম্বিত করার জন্য নববধুদের নিজস্ব মতামত প্রদান বা মুরব্বীদের সঙ্গে এ-বিষয়ে যোগাযোগ একেক ক্ষেত্রে একেক মাত্রার হয়ে থাকে। তাঁর গবেষণায় দেখা গেছে, মহারাষ্ট্রে বিষয়টি ঘটেছে সবচেয়ে কম মাত্রায় এবং বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক নববধু তাদের মতামত কাজে লাগাতে পেরেছেন। ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশেই সরকারি পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম কতটা সফলভাবে গণসচেতনতা তৈরি করতে পেরেছে তার ওপরই বিষয়টি নির্ভর করছে বলে এই গবেষক মন্তব্য করেছেন।

মিস মনীষা খালে'র গবেষণা-উপাত্ত অনুযায়ী নববধুরা প্রায়শই শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং তিনি এই শারীরিক নির্যাতনের তিনটি সময়কাল নির্ণয় করেছেন। এগুলো হলো: বিয়ের অব্যবহিত পর, গর্ভধারণের সময়, এবং সন্তান প্রসবের পর। পরিবারে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতাই এজন্য দায়ী বলে মিস মনীষা মনে করেন। নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য সরকারি ও সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণের ওপর তিনি জোর দেন।

ড. বড়ুয়া'র গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুসারে মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও বাংলাদেশে গর্ভবতী নারীদের খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ করা গেছে। গর্ভকালীন সময়ে কম খাবার খেয়েছেন এমন মহিলার সংখ্যা কমই পাওয়া গেছে। গর্ভকালীন সময়ে কাজের চাপ ও বিশ্রাম বিষয়ে তারা যে উপদেশ পেয়েছেন তা সব ক্ষেত্রে এক রকম ছিলো না। অনেকে গর্ভকালীন সময়েও দীর্ঘদিন ধরেই ভারী কাজ করেছেন। উপসংহারে এই গবেষক মন্তব্য করেছেন, সব ধরনের স্বাস্থ্যকর্মী, এমনকি আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের উচিত নারীর গর্ভকালীন সেবাযত্ন, খাবার গ্রহণ, শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণ, কাজের চাপের পরিমাণ এবং বিশ্রাম বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কারণ সুস্থ ও সঠিক জন্ম-ওজনের শিশু প্রসবের জন্য মায়েদের স্বাস্থ্যই প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং দেশের ভবিষ্যত নাগরিক হিসেবে সুস্থ-সবল শিশুই সকলের কাম্য। ■

# বেবি জিঙ্ক দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে

**কাজী মুনিসুল ইসলাম**
আইসিডিডিআর,বি

জিঙ্ক বা দস্তা মানুষের শরীরের জন্য একটি প্রয়োজনীয় উপাদান যা বিভিন্ন বিপাকীয় কার্যকলাপ এবং প্রোটিন-সংশ্লেষণে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকে। শরীরের স্বাভাবিক বিপাক প্রক্রিয়া, কোষের বৃদ্ধি এবং রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুদেরকে খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি জিঙ্ক খাওয়ালে ডায়রিয়ার তীব্রতা, মেয়াদকাল এবং পুনরায় ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

সিরাপ আকারে তরল জিঙ্ক বহুদিন থেকেই প্রচলিত ছিলো। বর্তমান দশকের প্রথমদিকে আইসিডিডিআর,বি প্রথমবারের মতো ট্যাবলেট আকারে জিঙ্ক প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করে, কারণ জিঙ্ক ট্যাবলেট দামে সস্তা এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ খুবই সহজ এবং দীর্ঘকাল ঘরে থাকলেও এর গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে। ফ্রান্সের 'নিউট্রিসেট' নামের একটি অষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশের একমি ল্যাবরেটরিজ-এর মাধ্যমে আইসিডিডিআর,বি 'বেবি জিঙ্ক' নামের এই নতুন ধরনের ট্যাবলেট এ-দেশে প্রচলন করেছে, যা খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। একটি ব্লিস্টার প্যাক-এ ১০টি ট্যাবলেট থাকে। কোনো শিশু ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি দৈনিক একটা করে ট্যাবলেট ১০ দিন খাওয়াতে হয়। একটি চা-চামচে পরিষ্কার পানি নিয়ে তাতে ট্যাবলেটটি ছেড়ে দিলে খুব দ্রুত গলে যায় এবং সাদা সিরাপের আকার ধারণ করে। তখন শিশুকে সিরাপের মত করে তা সহজেই খাওয়ানো যায়।

'বেবি জিঙ্ক' বাজারজাত করা এবং একে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য গৃহীত নানা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আইসিডিডিআর,বি-তে Scaling Up Zinc for Young Children (SUZY) নামের একটি প্রকল্প রয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশে যেখানে প্রায়ই শিশুরা নানারকম সংক্রামক ব্যাধিতে, বিশেষ করে ডায়রিয়ায়, আক্রান্ত হয়, তাদের মধ্যেই জিঙ্ক-এর স্বল্পতা বেশি পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি জিঙ্ক-এর ব্যবহার সবরকম ডায়রিয়ার তীব্রতা, দীর্ঘসুত্রিতা এবং পরবর্তী কালে ডায়রিয়া হবার আশঙ্কাও অনেক কমিয়ে ফেলে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে পৃথিবীতে ৭৫০,০০০ জন শিশু জিঙ্ক-এর অভাবজনিত রোগে মারা যায়। শুধুমাত্র ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিঙ্ক ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে এই মৃত্যুহার অর্ধেকে নামিয়ে আনা সম্ভব। বিভিন্ন গবেষণামূলক ও পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ-এর সুপারিশ মোতাবেক আইসিডিডিআর,বি ডায়রিয়ার চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে জিঙ্ক-এর ব্যবহার শুরু করার উপরোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করে।

২০০৪ সালের মে মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ যৌথভাবে পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিঙ্ক ব্যবহারের সুপারিশ করে। একই সাথে তারা এর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসেবে অতিরিক্ত বমি বা মুখ থেকে অষুধ উগরে ফেলার মত সমস্যাগুলো পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ দেয়। ট্যাবলেট আকারে জিঙ্ক ব্যবহারের পর কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় কি না তা পরীক্ষা করার জন্য আইসিডিডিআর,বি-র মহাখালিস্থ ঢাকা হাসপাতালে একটি গবেষণা পরিচালিত হয়। এই গবেষণাকর্মের প্রধান ছিলেন ডাঃ আলী মিরাজ খান। এই গবেষণায় ৩ থেকে ৫৯ মাস-বয়সী ৪২,৪৪০ জন ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশুর প্রত্যেককে বেবি জিঙ্ক-এর মাধ্যমে প্রতিদিন ২০ মিলিগ্রাম জিঙ্ক সালফেট ১০ দিন পর্যন্ত খাওয়ানো হয় এবং পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার জন্য এদেরকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। বেশিরভাগ শিশুর মধ্যে কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াই দেখা যায় নি। কিছুকিছু শিশুর একবার (শতকরা ২১.৮ ভাগ) বা দু'বার (শতকরা ৮.৭ ভাগ) বমি হয়েছিলো, কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেলো এসব শিশুর শতকরা ৮৫.৮ ভাগের আগেও বমি হতো। উপরন্তু, আইসক্রিমের মতো ভেনিলার গন্ধযুক্ত হওয়ায় শিশুরা এই ট্যাবলেট খেতে খুব মজা পায় এবং মুখ থেকে উগরে ফেলার ঘটনাও দেখা যায় নি। অতএব উপরোক্ত গবেষণায় এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, নতুন প্রচলিত 'বেবি জিঙ্ক' নামের এই ট্যাবলেট ডায়রিয়ার চিকিৎসায় অত্যন্ত উপকারী তো বটেই, এর কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াও নেই বললেই চলে। অপরদিকে, দীর্ঘদিন থেকে প্রচলিত তরল জিঙ্ক সিরাপ অনেক সময় বমির ভাব জাগায় এবং একধরনের বিশ্রী গন্ধের কারণে উগরে ফেলার ঘটনাও অহরহ ঘটে থাকে। আইসিডিডিআর,বি তাদের নিজস্ব ঢাকা হাসপাতালে জিঙ্ক ট্যাবলেটের ওপর প্রয়োজনীয় গবেষণা শেষ করে তবেই এক্মি ল্যাবরেটরিজ-এর মাধ্যমে ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে 'বেবি জিংক' বাজারে ছেড়েছে।

দেশী-বিদেশী বিভিন্ন গবেষক ও শিশু-বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন সভা ও সেমিনারে জিঙ্ক ট্যাবলেটের গুণাগুণ এবং ভালো অবস্থায় ঘরে রাখার দীর্ঘ মেয়াদকাল, দাম ও সফলভাবে খাওয়ানোর সুবিধাদি বিষয়ে এর প্রশংসা করেছেন।

বর্তমানে 'বেবি জিঙ্ক' বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আফ্রিকার কয়েকটি দেশে এবং ইন্দোনেশিয়ার শিশু-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পরিচিত হয়ে উঠছে এবং বিশ্বব্যাপী প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। ■